KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮/১০৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ যাদবপুর,
Collection : KLMLGK	Publisher : রূপালী রায় (2/3) অমর রায় (5)
Title : অরণ্য (ARANYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2/3 5	Year of Publication : 1972 1975
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মৃণাল রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Phone : 23-7241

With the best compliments from :

M/s. Lakhmidas Premji

PACKERS OF AGMARK

LAKHMI GHEE

8, BOWBAZAR STREET,
CALCUTTA-12

HERE WE ARE
FOR PROMPT SAFE & ECONOMICAL
TRANSPORTATION OF CARGO
DAILY BY ROAD AND AIR
TO
ASSAM CACHAR TRIPURA

Contact

SUREKA AIR TRANSPORT

PREMIER AIR & ROAD CARRIERS

(Authorised Agents of Indian Airlines)

119/B, Chittaranjan Avenue, Calcutta-7

Telephone No. 34-2884
34-2092

Branches :

Motor Stand	Kedar Road	Station Road	Janiganj
Agartala	Gauhati	Karimganj	Silchar
Phone : 839	Phone : 4615	Phone : 252	Phone : PP-76

অরণ্য

মননশীল চতুর্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
২য় বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১৯৭২ ॥ সূচীপত্র

প্রবন্ধ :

জীবনানন্দ ও কল্পনাপ্রতিভা ॥ হরপ্রসাদ মিত্র
অভিনয় শিল্প ও গিরিশচন্দ্র ॥ অসীম বসু

গল্প :

আশ্রয় ॥ তুলসী সেনগুপ্ত
মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুর ॥ জয়া রায়
গাছ জানে পাখি জানে রুনু জানেনা ॥ রবীন্দ্র গুহ
শেষ এর পর এলো ॥ বাণীব্রত চক্রবর্ত্তী

কবিতা :

শুরু না বিদায় ॥ শান্তিকুমার ঘোষ
বেস তাহলে যুদ্ধই হোক ॥ স্বপন রায়
ভালবাসা তোমার বুকে এই সব রং ॥ ফণিভূষন চক্রবর্ত্তী
মানুষের সারি ॥ মানস রায় চৌধুরী
তবু কেন ॥ সৈয়দ কওসর জামাল
জলের শাড়ীর নীচে ॥ সাধনা মুখোপাধ্যায়
অন্বেষণ, কেন দুঃখ ॥ গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
তবু তোমাকে নিয়ে ॥ রঞ্জন পাল রায়

প্রচ্ছদ : অন্নদা মুন্সী

সম্পাদক : স্বপন রায়

সহঃ সম্পাদক : রঞ্জন পাল রায়

কার্য্যালয় : ৮/১০৩, বিজয়গড় ● যাদবপুর ● কলিকাতা-৩২

সম্পাদকীয়

শতবর্ষ উদ্‌যাপন

মহাত্মা রামমোহনের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন, শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তিতে এই বছরটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যথারীতি এই ত্রিবিধ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্যে যথেষ্ট ঢাক-ঢোল পেটানো হয়েছে, অবশিষ্ট দিনগুলোতে হয়তো আরও হবে। এই সমস্ত আয়োজনের অসারত্বের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। যে মন কিছু পাবে বলে আশা করে থাকে সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে এই সব অনান্তরিক আড়ম্বরপূর্ণ ব্যর্থ লৌকিকতায়।

আসলে শতবর্ষ উদ্‌যাপনে আমাদের স্ফূর্তিটা ইদানীং বেড়েছে। বোধ হয় রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপনের পর থেকেই। উদ্‌যাপনের দিনগুলোতে হঠাৎ দেখা যায় কিছু একটা করার জন্যে সারা দেশ জুড়ে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এতদিন উপেক্ষিত সুধী পণ্ডিত জনের দরজায় কড়া ঘন ঘন বেজে উঠছে, কাগজে কাগজে আলোচনার নামে ঝুড়িঝুড়ি লেখা বেরোতে থাকে যার বেশীরভাগই পড়তে গেলে 'সারিডনের' দরকার হয়। সভাসমিতিতেও তাই। এই উপলক্ষ্যে কখনও কখনও দু'একটা জীবনী চিত্রও (চলচ্চিত্র) তৈরী হয়ে যায়। ব্যস্—তারপর সব চুপচাপ। ঠাণ্ডা। হা রামমোহন, হা অরবিন্দ, হা বলেন্দ্র, দীনবন্ধু!

অর্থাৎ অস্বীকার করা যায় না আমরা দিনে দিনে হিড়িকবাজ—হুজুগে হয়ে যাচ্ছি। হুজুগটাই প্রধান। সেটাকে বজায় রাখার জন্যে নিত্যনূতন অজুহাত খুঁজি। আসল জিনিষটাকে আড়াল করে, আড়ম্বরকে অসভ্য হল্লাবাজিকে আকাশে তুলে ধরি। কখনই এই সব মহাপুরুষের মহান্ জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যকে অন্তরে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোথায় রামমোহনের দীপ্ত,

উজ্জ্বল মুখ? কোথায় সেই তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধীনতা প্রিয়তা? ভাবাবেগ আড়াল করা পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিবাদের উজ্জ্বল আলো আমাদের অন্তরে কোথায়!

কোথায় সেই বিপ্লব যা অরবিন্দের যৌবনের স্বপ্ন? অরবিন্দের ভাবী জীবনে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটেছিল। যার দ্বারা মনে হয় এটাই আপনা আপনি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে শুধু বিপ্লব চিন্তাই মানব মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই চিন্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার সমন্বয় ঘটানোটাই বড় কথা। কোথায় সেই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা?

পরিশেষে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কথা। কী পেয়েছি আমরা এই একশো বছরের রঙ্গমঞ্চ সাধনার? একজন ভালো নাট্যকার (রবীন্দ্রনাথ বাদে),? ভালো নাটক? জাতীয় নাট্যশালা? মনে পড়ে, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু-শেখর, অমৃতলাল, অমরেন্দ্র প্রমুখের কথা। যাঁরা সেদিনের শত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও রঙ্গমঞ্চের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য গঠন করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

আর্থিক দৈন্য, সমাজ নিন্দা, সরকারী রোষনয়ন উপেক্ষা করে, এইসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি একদিন যা করতে পেরেছিলেন আজ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও সেই অনুপাতে কী করতে পেরেছি? শিশির ভাদুড়ীর আমরণ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ কি সম্ভব হয়েছে? নাটকের প্রতি সাধারণ মানুষের অনুরাগ বেড়েছে, নাট্যানুশীলণের ক্ষেত্রও যথেষ্ট বিস্তৃত। তবু, একজন সৎ, নির্ভীক নাট্যকার আমরা পেয়েছি কি?

আর জাতীয় নাট্যশালা—?

A Nation is known by its theatre—একথা যদি সত্য হয়, তাহলে নাবলে উপায় নেই যে আমরা আজো এক নগ্ন দৈন্যদশায় দিন যাপন করছি। সভ্যতার আলোক দুয়ার এখনও আমাদের কাছে দূর অস্ত। এ এক নিদারুণ লজ্জা, এ এক দুরপনের কলংকের কথা।

———

প্রবন্ধ

জীবনানন্দ ও কল্পনাপ্রতিভা

হরপ্রসাদ মিত্র

'ইমাজিনেশন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ কল্পনা আর 'ফ্যান্সি'র আকল্পনা—এই পরিভাষায় আমরা অভ্যস্ত। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'-তে 'ইমাজিনেশন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কল্পনা প্রতিভা' ও 'ভাব প্রতিমা' দুটি শব্দেরই প্রয়োগ প্রস্তাব করেছিলেন। আবার কবিকর্ম্মের তাগিদের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি প্রেরণার অস্তিত্বও অস্বীকার করেন নি। তবে 'কল্পনা প্রতিভা' ব্যতিরেকে প্রেরণা কার্যকরী হওয়া কবিতার ক্ষেত্রে অসম্ভব, এরকম সিদ্ধান্তেরও ইঙ্গিত আছে ঐ বইখানিতে। বিজ্ঞানচেতনা, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদি নানা আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি এই সূত্রে বুঝিয়ে গেছেন। সেইসঙ্গে 'সমচেতনা' কথাটির ওপর,—নিজের কবিতা প্রসঙ্গে তিনি একটু বেশি জোর দিয়েছিলেন। মোদ্দা কথা, ইহজগৎ নতুন করে পরিকল্পিত হয় সার্থক কবিতায়—এই ছিল তাঁর বক্তব্য এবং এ বাণী কাব্যতত্ত্বের সনাতনী শ্রুতি। এতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়।

কবিতার সমালোচককে তিনি যথাসাধ্য পৃথিবীর সব ভালো কবিতাই পড়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার সমালোচক যাঁরা, তাঁরা অন্তত আলাওল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা যা লেখা হয়েছে সবই পড়ে নেবেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সেই সঙ্গে ইংরেজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিতা এবং সংস্কৃত কাব্যধারারও জ্ঞান থাকা চাই তাঁদের। কিন্তু কেন যে আলাওল থেকে, কেন যে তার আগেকার কবি বড়ু চণ্ডীদাসের, কৃত্তিবাসের বা কাশীরাম দাসের নাম তিনি

বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি, সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। হয়তো তিনি ঠিক সমালোচনার শাস্ত্র লেখবার চেষ্টা করেননি বলেই এসব অনুল্লেখ চোখে পড়ে। যাই হোক্ এসব গৌণ ব্যাপার। তাঁর কবিতাই তাঁর আসল অন্তর্মন। সেই ক্ষেত্রেই তাঁর আত্মপরিচয় ধর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগে—'কল্লোলে'র সময়ে বাংলা কবিতায় একটা নতুন প্রস্তুতির সূচনা ঘটেছিল—একথা তিনি নিজে বলে গেছেন। এইখানে তিনি নিজে জড়িত। তাই তাঁর আত্মকথার এ দিকটি বিশেষ নজরে পড়বার সামগ্রী। তিনি জানিয়েছেন—"জ্ঞান ও অর্দ্ধজ্ঞানের নানারকম সংকেত রয়েছে যা তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি।" রবীন্দ্র নাথের গদ্য কবিতা যে একটা বিশেষ ভঙ্গি, সেকথারও উল্লেখ ছিল এই রচনায়। কল্লোলে—"যে দিক দিয়ে সে সব কবিরা নতুন ভূমিকা সামান্য পরিমাণ নিতে পেরেছিলেন সেটা মানুষের জীবনের একটা বিচিত্র দিককে নিয়ে অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব অসাহিত্যিক নিমজ্জনের ভিতর।" এও জীবনানন্দের কথা।

পাঠককে যথার্থ আধুনিক কাব্য ভাষায় দীক্ষিত হতে হবে—এ কথাও তিনি বলে গেছেন। আর লিখেগেছেন—"কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে পাঠকের কাছ থেকে; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছনো দরকার। একবার পৌঁছতে পারলে পাঠকের মনের নমনীয়তায় আধেয় হিসাবে থাকবে সে। কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একজন ও বিভিন্ন পাঠকের অর্থকৃৎ মনের বিভিন্ন রকমের আলোকিত অবস্থার। অর্থ অস্বচ্ছ বোধ হলে কবিতাটির ধ্বনিগুণ সম্পর্কে অন্তত চেতনার স্পষ্টতায় পাঠকের সুবিধা হবে মনে হয়; কবিতাটির ইঙ্গিত ধরা পড়বে তাহলে; অর্থ পরে বোঝা যেতে পারে।" সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কিত চেতনার বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে তিনি লেখেন—"ইতিহাস বেদের দরকার—এবং সমাজ বেদের; কিন্তু সব কবিতায়ই একই ভাবে, অথবা কোনো কবিতায়ই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়; কবিতার চেয়ে তার উপকরণ বড় হবে না।"

জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর কাছাকাছি সময় থেকে

অদ্যাবধি অনেক সুধী সমালোচক আগ্রহী হয়েছেন এবং রয়েছেন। স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি জীবনানন্দ দাশ' বই-খানিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জীবনানন্দের নিজের শ্রদ্ধাবোধ ও অপরিসীম ঋণস্বীকৃতির উল্লেখ করে গেছেন। জীবনানন্দ যে কবি হিসেবে স্বাবলম্বী অথচ ঐতিহ্যবাদী, এ দুটি দিক সঞ্জয়বাবু বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। ইয়েট্‌সের সঙ্গে জীবনানন্দের কবি মানসিকতার যোগ সঞ্জয়বাবুর বইখানির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই আলোচিত হয়েছিল—অবশ্য খুবই সংক্ষেপে। রিল্‌কে, এলিয়ট এবং জীবনানন্দ—তিনজনের সময়চেতনা সম্বন্ধেও তিনি এক নিঃশ্বাসে কিন্তু বলে গেছেন। 'সেদিন এ ধরনীর' নামক প্রসিদ্ধ কবিতা-টিতে সঞ্জয়বাবু জীবনানন্দকে শেলির মতো আকাশ অভিসারে নিযুক্ত দেখেছিলেন। 'ঝরা পালক থেকে' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে একই অভি-ব্যক্তির পথ, একথা যাঁরা সঞ্জয়বাবুর আলোচনা দেখেছেন, তাঁরা নিজেদের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত—এবং তারপর মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ ব্যবচ্ছেদ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ইত্যাদির দশকাণ্ড অতিক্রম করেও সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় ঘাস, আকাশ, তারা, মাটি, হেমন্ত ঋতু, মৃত্যু, প্রেম ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার দেখা দেয়। তাঁর 'ঘোড়া' 'ধূলি সন্ধির নৃত্য' ইত্যাদি যেমন, বনলতা সেন' ও তেমনি সুপরিচিত বহু আলোচিত কবিতা। তাঁর প্রধান অনুভূতি যে বিষাদ, এ বিষয়েও বোধ হয় মতান্তর হবেনা।

'ঘোড়া' কবিতাটির মধ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যেভাবে মিশেছে 'বনলতা সেন' কবিতায় সে ভাবে নয়। সঞ্জয়বাবু 'ঘোড়া' কবিতার হপ্‌কিন্সের মতন বহির্জগতে নিজের Vision অভিক্ষেপের প্রয়াস অনু-ভব করেছিলেন। পৃথিবীর মানবসমাজ এবং প্রকৃতির তরুলতা নদী মাঠ সকলেরই সঙ্গে নিজেকে আন্তরিক ভাবে সযুক্ত রেখেছিলেন জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের চিত্রকল্প একটি বহুশ্রুত প্রসঙ্গ। অনেকেই এ বিষয়ে কিছু কিছু লিখেছেন। 'চিত্রকল্প' না বলে, কেউ কেউ 'বাক্‌প্রতিমা'

কথাটি ব্যবহার করবার পক্ষপাতী। 'ঝরাপালক' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহা পৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' —তাঁর নানা বইয়ের নানা কবিতা থেকে চিত্রকল্পের নানা উদাহরণ দেখিয়ে অনেক রকম শ্রেণীবিভাগের চেষ্টাও বিরল নয়। এই সূত্রে তাকে কেউ কেউ সৌন্দর্যাভিসারী কবি বলে-ছেন, কেউ বলেছেন বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার গোত্র মিলে যায়, কেউ বলেছেন তিনি অনেক জায়গায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতন। এভাবে সাদৃশ্যের তালিকা বাড়ানো উৎসাহী যুবমনের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। বোধ হয় আর একটু ভেবে দেখলে তাঁরাই অনুভব করবেন যে, এই ধরণের সাদৃশ্য-সংকেত তাঁকে চিনে নিতে বিশেষ সাহায্য করেনা। প্রত্যেক মানুষই অনেক দিক দিয়ে অন্যান্য অনেকের মতো, কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথকসত্তা নয় কি? জীবনানন্দের সেই নিজস্ব সত্তা তাঁর ভাষায়, পদবিন্যাসে, বাক্‌প্রতিমায়, প্রকৃতি চেতনায়, সময়চেতনায়, মৃত্যুবোধে,—নারী নদী আকাশ কীটপতঙ্গ ভালোবাসা ইত্যাদির সমবায়-স্বাতন্ত্র্যে নিহিত। এ অতি সাধারণ কথা। এবং যা সত্য, তা ভারি সহজ। তিনি অদ্বিতীয় তিনিই। জীবনানন্দের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনন্য। কখন তিনি 'নরম নদীর মতো নারী' বলবেন, আর কখন অবিমিশ্র 'মেয়ে মানুষ' বলবেন, সে কি তাঁর অন্তরমন ছাড়া আর কেউ বলতে পারে? 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' আর কোনো বাঙালী কবি বলেন নি,—চণ্ডীদাস নয়, আলাওল নয়, মধুসূদন নয়, রবীন্দ্রনাথও নয়—এইটুকুই শেষ স্বীকার্য আনন্দ। মমি, স্ফীঙ্কস্,—মালতীলতার বন, কেয়াফুল,—মসুদ চীনা তাতারের দল,—কপোতবধূ, ডালিফুলের মতো ঠোঁট, ঘুম কুমারীর মুখে চুমো,—'ক্লৈব্যের হ্রদে এসেছিলে তুমি ওগো পুরুষোত্তম' ইত্যাদি শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য আরো বহু কবি ব্যবহার করতে পারেন,—জীবনা নন্দ ও করেছিলেন, কিন্তু এইসব উপকরণের মধ্যে তিনি নেই। পেঁচা, চাঁদ, শিশির, নিষ্পেষিত মনুষ্যত্ব, মহাত্মা গান্ধী, সামান্য মানুষ, মহিলা, নারীসবিতা, মিশর, বিবেকানন্দ, বেদিয়া, সরাই খানা—কতো কী প্রসঙ্গ এসেছিল তাঁর কবি মনে। কিন্তু এসব তালিকার মধ্যেও তিনি নেই। 'নিখিল আমার ভাই'—কথাটা তিনিই লিখেছিলেন, কিন্তু এখানেও তাঁকে পাই না। এসব মামুলি বৃত্তান্ত,—কবিত্বের সার্বজনীন ভাঁড়ার থেকে সংগৃহীত উপকরণ মাত্র। জীবনানন্দের স্বকীয়তা তাঁর ইমাজিনেশ-

নেই নিহিত—সেই যাকে তিনি 'কল্পনা প্রতিভা' বা 'ভাবপ্রতিমা' বলতে চেয়েছিলেন। সব রচনায় সব ক্ষেত্রে তিনি যে সকল হননি, সেকথা স্বীকার্য। কিন্তু অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পথ পেরিয়েই তো মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যার নাম কবিতার সরস্বতী। সরস্বতী তাঁকে বিষণ্ণ করেছিলেন এবং সরস্বতীই তাঁকে চিরকালের কবি ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

———

প্রবন্ধ

অভিনয় শিল্প ও গিরিশচন্দ্র

অসীম বসু

নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir Ifor Evans তাঁর A Short History of English Literature গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন :

It is false to consider the drama merely as a partof Literature. For literature is an art dependent upon words, but drama is a multiple art, using words, scenic effect music the gestures of actors and the organising talent of a producer.

দৃশ্যপট, সঙ্গীত ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হলেও, নাটকের সফল ফলশ্রুতির জন্য সর্ব্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন সেটা হ'ল gesture, of actors.

নাটক লিখিত হয় অভিনীত হওয়ার জন্যেই। অভিনয়যোগ্যতার ওপরেই নাটকের যোগ্যতার পরিমাপ হয়ে থাকে। সুতরাং এই অভিনয় এবং অভিনেতৃগণ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য্য অংশ।

যুগে যুগে দেশে দেশে অভিনয় নিয়ে ঘনিষ্ঠ চর্চ্চাই অভিনয়কে একটা সম্মানজনক শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছে। শুধু অভিনয় করে বহু অভিনয় করে বহু অভিনেতা আজ পর্য্যন্ত অমর হয়ে আছেন, তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর মৌলিকতার কৌলীন্যে। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম প্রথমে আসে তাঁরা হলেন, গ্যারিক, অ্যারভিং, স্তানিস্লাভস্কি ককেলাঁ, সারা বার্ণা, মিস্ সিডন্স, গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, শিশির ভাদুড়ী ইত্যাদি।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব নট রূপেই। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশীতে' 'নিমচাঁদের' ভূমিকাই গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম

অভিনয়। অমৃতলালের ভাষায়

মদেমত্ত পদটলে, নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নবনটগুরু তার।

প্রথম অভিনয় থেকেই গিরিশচন্দ্র অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যখনি যে চরিত্র তাঁর অবিস্মরণীয় শিল্পী-প্রতিভা স্পর্শ করেছে তাই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায়, নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অনবদ্য অভিনয় দেখে দীনবন্ধু মিত্র বলে ছিলেন, "তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনীত হ'ত না, নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্য লেখা হয়েছিল।" এরপর গিরিশ যে নাটকই অভিনয় করেছেন, সে নাটকই দর্শক সাধারণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। 'কৃষ্ণকুমারী'তে 'ভীমসিংহ' 'প্রফুল্লতে' 'যোগেশ' 'নীলদর্পণে' উড্‌সাহেব' প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছিল। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের এক সংকটময় লগ্নে গিরিশচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করে, নাট্যজগতে এক গভীর বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন।

> গিরিশ প্রতিভা তিন দিক দিয়ে বাংলা থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেছে—নাটক রচনা, অভিনয় রীতির পরিপুষ্টি বিধান আর রঙ্গঞ্চের সংস্কার ও সংগঠণ।
>
> [মনি বাগচি—শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার]

শুধু মাত্র অভিনেতা তিনি ছিলেন না, ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য শিক্ষকও। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি দল করেছেন, অভিনেতা এবং (পরে অভিনেত্রীও) তৈরী করেছেন, সফল নাট্যপ্রযোজনা করে এক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছেন।

অভিনয় সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী না থাকলে অভিনেতা তৈরী করা যায় না। গিরিশচন্দ্রের ছিল সেই ধারণা। পূর্ববর্তী অভিনয় ধারাকে বদলে দিয়ে নিজের ধারা প্রবর্তন করার মত ক্ষমতা তার ছিল। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় সম্বন্ধে অমৃত লালের মন্তব্য এইরকম:

> "পূর্ববর্তী থিয়েটারে প্রধান অভিনেতারা ভাবভঙ্গিসহ রসাভিনয় করিতেন বটে কিন্তু অনেক সময়ই তাহা অনুকরণ বোধ হইত, ভিতর হইতে যেন বলিতেন না।

> কিন্তু গিরিশবাবু ও অর্ধেন্দুবাবু বলিতেন তাহা যেন ভিতর হইতে তাহারা feel করিয়া acting করিতেন এবং সেইরূপ শিখাইতেন।

তাঁরই নির্দেশিত পথে শিক্ষা লাভ করে সেই সময় যাঁরা অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁদের আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। যেমন, অমৃতলাল, মহেন্দ্রনাথ, বিনোদিনী ইত্যাদি।

কি ধরণের অভিনয় তিনি করতেন? যে অভিনয় পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষা দিতেন তার রূপরেখা কি?

গিরিশচন্দ্রের মতে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে অভিনেতাকে উপযুক্ত আকার এবং কণ্ঠের অধিকারী নিশ্চয় হতে হবে। "কণ্ঠস্বর ও আকারাদি-গত ত্রুটি অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়।"

অভিনেতাকে অভিনেয় চরিত্রের মূলতত্ত্ব সর্বাগ্রে অধিগত করতে হবে। চরিত্রের যথার্থ conception না এলে, শুধু হাত পা নাড়াই সার হবে, যথার্থ অভিনয় হবে না। "নাট্যকার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছেন নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সেই ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হয়।"

অভিনয়ে স্বভাবত action এর গুরুত্ব অনেক গিরিশচন্দ্র জানতেন। মুভমেণ্ট যদি চরিত্রের উপযোগী না হয় তবে অভিনেয় চরিত্রের বাস্তবতা নষ্ট হয়।

> "সৈনিকপুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি মুখে ব্যূহরচনা করিতেছে, মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গিতে মালা গাঁথে এই সকলের প্রতি অভি-নেতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

সার্থক অভিনয়ের জন্যে চাই নিমগ্নতা। যে চরিত্র অভিনীত হবে সেই চরিত্রের আচার, ব্যবহার, মুদ্রা, স্বরভংগী ইত্যাদি যদি আয়ত্তের মধ্যে না আসে তবে সঠিক অভিনয় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

> "কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়।"

এই হ'ল অভিনয়ের মূল কথা। বিশ্বের বেশীর ভাগ খ্যাতনামা

অভিনেতার এই হ'ল মনের কথা। স্তানিস্লাভস্কির মুখেও শুনেছি এই একই নির্দেশ: Be yourself in every part, he pleaded, but be different in every part. Your environment is different, your life story is different, and hence, your mentality and your sense of values and your conduct (Yuri Zavadsky Introduction to Stanislavsky centennial collection)

গিরিশচন্দ্রের 'ধ্যান' শব্দটি লক্ষ্যনীয়। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে একান্ত হওয়া যায় তার একটা পথনির্দেশ আমরা স্তানিস্লাভস্কির কাছে পাই। তিনি বলেন, অভিনয়কে প্রাণবান করতে হলে, যান্ত্রিকতা দোষ থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রয়োজন Spiritual makeup এর। There was the necessity not only of a Physical make up but of spiritual make up before every performance. Before creating it was necessary to know how to enter the temple of that spiritual atmosphere in which alone it is possible to create.

'ধ্যান' শব্দটি এবং Spiritual makeup' কথা দুটি অদ্ভুত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বরপ্রক্ষেপের উপরও গিরিশচন্দ্রের নজর ছিল। তিনিও জানতেন যে অভিনেতাকে শুধু সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলবেনা। তাঁর কণ্ঠস্বর "শ্রোতৃবর্গকে শোনাইতে হইবে।" "নায়কের সহিত নায়িকার মৃদু প্রেমকথা শুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন।" শুধু তাই নয় নাটকের খাতিরে উচ্চারণের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রয়োজন আছে। বড় বড় অভিনেতা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ সংলাপকে বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করেন, যাতে দর্শকের মনোযোগ সেইখানে আকৃষ্ট হয়।

"যেখানে নাটকের কোন পংক্তিতে একটি বিশেষ ভাব আছে সেইখানে সেই ভাবটি দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না।" নাটকের রসবস্তু অভিনেতাকে যেমন নিজে বুঝে নিতে হবে, তেমনি দর্শককে বোঝানোর দায়িত্বও তাঁর। এই দায়িত্ববোধ গিরিশচন্দ্রের ছিল, অপরকেও তাই এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে কোন কোন নাটকে দেখা যায়, কোন বিশেষ দক্ষ

অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে একাই অভিনয় করে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর co-actor রা কি করছেন, তার দিকে মোটেই তার নজর নেই। এটা নাটকের সামগ্রিক ফলশ্রুতির পক্ষে বিষম ক্ষতিকর। সকল প্রথম শ্রেণীর প্রযোজক পরিচালকের মত গিরিশচন্দ্রের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর থাকতো। তিনি বলতেন:

"নটের আর একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্তব্য।... নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায় তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া নটের একটি প্রধান কর্তব্য।"

সুতরাং ধ্যানস্থ হয়ে অভিনয় করলেও একেবারে আত্মহারা হয়ে অভিনয় করলে চলবে না। ভাবাহত হয়ে অভিনয় করার বিপক্ষে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই। গিরিশ চন্দ্রের মতে:

"নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইয়াছে কিনা—"

অভিনয়ে সাফল্য চাইলে অভিনেতাকে এই দ্বিসত্তার অধিকারী হতে হবে। ককেলাঁর ভাষায়:

Study your part, enter into the skin of your character but never abdicate, hold the reins.

অন্যান্য শিল্পের মতো অভিনয় শিল্পও সাধনা সাপেক্ষ জিনিষ। এর জন্য চাই প্রচুর অনুশীলন। দেশী বিদেশী নাট্য চর্চার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার। কোন অভিনেতা কিভাবে অভিনয় করেছেন, অভিনয় সম্বন্ধে কোথায় কি মত প্রকাশ করেছেন, এসব জ্ঞান অভিনেতার উন্নতির সহায়ক। গিরিশ চন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতা এই, বিশেষ পল্লী থেকে সংগৃহীত মূর্খা রমনীকেও এই ধরণের শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা করে তুলে, তাকে অভিনয়ের উপযোগী মানসিকতা দান করতে পারতেন। বিনোদিনীর লেখা থেকে আমরা এসব জানতে পারি:

"গিরিশ বাবু আমাকে পার্ট অভিনয়ের জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দেবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্ট গুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তারপর পার্ট মুখস্থ করিতে

বলিতেন। তাহার পর অবসর মতো আমাদের বাটীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু (ভূনীবাবু) আরো অন্যান্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়র মিলটন বায়রণ পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন কখনও তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন।"

[আমার কথা—বিনোদিনী দাসী]

গিরিশচন্দ্র উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। অভিনয় রীতির উপর তাঁর বিশেষ পড়াশোনা ছিল। তাই তাঁর অভিনয় শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে বিদেশী প্রভাব ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিজস্ব প্রতিভা, এবং উঁচু দরের ব্যক্তিত্ব না থাকলে বাংলা রঙ্গমঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন না। তিনিই বাংলা থিয়েটারের মরা নদীতে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। তার উত্তরসূরীরা তাঁরই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে দিয়েছেন। বাংলা নাটক এবং প্রয়োগ রীতির উপর আজ যে পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা যায় গিরিশ-চন্দ্রকে তাঁর শুভ সূচনাকারী বলতে কারো দ্বিধা নেই।

———

গল্প

আশ্রয়

তুলসী সেনগুপ্ত

কখন যে ভোরে ভিখু বিছানা ছেড়ে উঠে কাঠ চেড়াইএর কাজে চলে যায় টের পায় না বাসু। অনেকদিনই ভেবেছে বাসু যে, বাবাকে সে অবাক করে দেবে একদিন না একদিন। কিন্তু সারারাত ঘুমোবার পরও ভোর হ'লে, সূর্য অনেকদূর আকাশের গায়ে ঝুলতে থাকলে ওর মা ওকে তুলে দেয়। ঘুম চোখে ও বোকার মত চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একসময় ও বুঝতে পারে বেলা অনেক হয়েছে। পাথরের মত আঁকিবুকি কাটা মার মুখটাও একটু পরেই স্পষ্ট দেখতে পায়। আর স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর বাবা ভিখুর ক্লান্ত শিরাবহুল মুখটা আর যেন শুনতে পায় কাঠের বুক চিরে হিস্ হিস্ করতে করতে নেমে আসছে লম্বা করাত। ভিখুর সমস্ত মুখ, শিরা ওঠা হাত দুখানাতে কাঠের গুড়ো, চোখদুটো ভিখুর লাল এবং সজল।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ফাঁকা শূন্য দৃষ্টি মেলে আশপাশটা দেখে নিয়ে মুখ ধোবার জন্য পুকুর পাড়ে চলে আসে। কোথা থেকে মা একরাশ শুকনো পাতা, টুকরো টুকরো শুকনো গাছের ডাল বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরে নিয়ে আসছে দেখতে পায়। মনটা হা হা করতে থাকে মুহূর্তে বাসুর। মার ক্লান্ত পাথরের মত মুখখানায় চোখ পড়তেই বড় বেশী বিষণ্ণ হয়ে পড়ে সে। ইচ্ছে হয় দৌড়ে ছুটে যায় বাসু, মার কাছ থেকে ছিনিয়ে হাল্কা করে দেয় মায়ের বোঝা। ইচ্ছেটা কাজে

লাগাতে গিয়েই, ও কেমন অসার অবস হয়ে পড়ে। সবকিছু কি রকম তোলপাড় করতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখে বাসু। ও কি মনে করে প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে—মা—মা।

কতক্ষণ জানে না বাসু, সবকিছু ওর কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠলে পর দেখে, মার মুখটা বড় সুন্দর; এত সুন্দর যেন দুর্গা প্রতিমা। পাথরের মত ক্লান্ত মুখটা কী তাহলে সে ভুল দেখে? মুহূর্তের ভাবনা শেষ হ'তে না হতেই ও শুনতে পায় মা বলছে, 'হঠাৎ তুই দৌড়চ্ছিলে কেন বাবা। তুই তো কখনও এমন করিস না।'

কী বলবে বাসু। অনেক কথা মুখে এসেও হঠাৎ যেন আটকে যায়। বিষণ্ণ অবাক চোখে সে মা-র মমতাময় সুন্দর মুখখানাকে দেখতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কী হয়, বাসু দেখে, দেখতে পায়, মার মুখটা আবার সেই আগেকার মত ক্লান্ত পাথর হয়ে উঠছে; ও সেই মুখটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। মার ডানহাতটাকে শক্ত করে ধরে ও চোখ দুটো বুঁজে বলে—মা। বাসুর মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে শুধোয়, বাসু কী হয়েছে—বল! তুই হঠাৎ ও রকম করে ছুটছিলি কেন রে? তোর বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবে।

হিস্ হিস্ করা করাতের শব্দ আবার সে শুনতে পায়। রুক্ষ, রক্তিম সজল একজোড়া চোখ আবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একজাতীয় অভিমান, ভীষণ একটা রাগ ফুঁসতে থাকে বাসুর বুকের মধ্যে। বাসু জানে, বাবা সন্ধ্যের অন্ধকারে টলতে টলতে বাড়ী আসবে। মাকে মারবে, বকবে, বাসুর দিকে ফিরেও তাকাবে না। যদিই বা চোখ পড়ে অমনি বাবা 'বেজন্মার ব্যাটা' বলে গালাগাল দেবে, 'শালা শুয়োরের বাচ্চা, 'বেজন্মার ব্যাটা' থালি ঘুমোবে আর খাবে, বলেই বাসুকে লক্ষ করে এই ধরণের মন্তব্য করবে। ভাবতেই বাসুর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। অনেক কষ্টে সে ভাবটা গোপন করে মা-কে বলে, 'মা, হরিপদদা বলছিল……'

'কীরে? কী বলছিল হরিপদ?

অনেক কষ্টে উঠে বসে বাসু। বলে, আমি তো দেখতে পাই, হরিপদ-দা তো দেখতে পায়না—তাই?

—তাই কী?

'—হরিপদদা গায় ভাল, কিন্তু অন্ধ মানুষ, পথ চলতে কষ্ট হয়, তাই বলছিল, আমি যদি ওর সংগে থাকি তাহ'লে…'

জিগ্যেস করে ওর মা, তুই এসব ভাবিস কেন রে?

মার মুখের এই প্রশ্নে হেসে ফেলে বাসু। বলে, আমি এখনতো ভাল হয়ে যাচ্ছি, তাছাড়া বাবার বড় কষ্ট মা। সেই কোন ভোরে… মুখের কথা শেষ করতে পারেনা বাসু। অমনি ওর মা বলে ওঠে, কিন্তু তুই কি পারবি?

—কেন পারবো না মা। দেখো, আমার কোন কষ্ট হ'বে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে বাসু, 'আর তাছাড়া হরিপদদা বলেছে, সকাল সকাল বেরোতে পারলে, সকাল সকাল ফিরে আসতে পারবো। তুমি বাবাকে কিছু বোল না। আমি বাবাকে অবাক করে দেবো।'

* * *

অবাক হয়নি ভিখু, বরং এই প্রথম ভিখু তার বৌ মরণীকে পাশে বসিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলল। মরণীর বুকের ভেতরটা একটা অব্যক্ত কান্নার মাদল বেজে উঠলেও স্বামীর চামড়া সার জীর্ণ-মুখটার দিকে অপলকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। একসময় ভিখু গলায় প্রসন্নতার ঢেউ তুলে বলে, আজকে আমার বড় আনন্দের দিন; বেসো যে কোনদিন গতর খাটতে পারবে, ভগবান যে মুখ তুলে চাইবে, তা ভাবিনি বৌ…আহা ছেলেটারে বড় কষ্ট দি ছেলেটারে—বলেই অদ্ভুত একটা করুণ মুখ করে তাকিয়ে থাকে ভিখু মরণীর দিকে।

মরণীর মনটা হঠাৎ কেন যেন উদাস হয়ে যায়। ভাবে, বিকল-ছেলেটা যে এমন করে রোজগারের ধান্ধায় বেরোতে পারবে তা কি কখনও ভেবেছে সে। এই তো গত পৌষ মাসে উনিশ পেরিয়ে বিশে পা দিল বাসু। দেখতে দেখতে এতগুলো বচ্ছর হয়ে গেল। কত স্বপ্ন, কত সাধ ছিল মরণীর। দুদিন আগেও ভিখু যাচ্ছে তাই ভাষায়—বাসুকে গাল দিয়েছে, কিন্তু সে তো আর সাধ করে নয়, অনেক কষ্টে, অনেক দুঃখে ভিখু অমনধারা কথা বলে। নইলে, বাসু যখন পেটে তখন ভিখু রোজ রাতে মরণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, ভদ্দরলোকদের মত সেও লেখাপড়া শেখাবে; আরও কত কি, কত স্বপ্নই না দেখতো ভিখু। এসব মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলে

পর, মরণীর দুচোখের সাদা জমি জলে থৈ থৈ করে; বুকের ভেতরটা শ্রাবণ আকাশের মত গুরগুর করে ওঠে। হঠাৎ কী মনে করে প্রশ্ন করে মরণী ভিখুকে; হ্যাঁগো, ছেলেটা যদি রাস্তায় ফিট হয়ে পড়ে যায়, তাহ'লে?

কথা কটি কানে যাওয়ার সংগে সংগে ভীষণ রাগ হয় ভিখুর। মরণীর দিকে একটা রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, 'এই শালার প্যান-প্যানানি শুরু হল। কেন, ডাক্তার তো বলছে, বেসো ভালো হয়ে গেছে।' বলেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে, একটা বিড়ি ধরায় ভিখু।

ও কথায় মরণী দুঃখও পায় না, রাগও করে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ফেলে আপন মনেই যেন বলতে থাকে, 'ভয় হয়, বড্ড ভয় করে যে!'

এবার হেসে ফেলে ভিখু। গলাটা নরম করে বলে, ওসব কথা শুনলে মাথাটায় আমার আগুন জলতে থাকে। ঘাবড়াস নে বৌ, আমারও ছেলেবেলায় অমন হোত। তবে ফিটের রোগ নয়, দুদিন একদিন অন্তর অন্তরই জ্বর আসতো, ঘুষঘুষে জ্বর। সব্বাই কত আনন্দ করত, ফূর্তি করত, আর আমার মা আমার কাঁথা জড়িয়ে দাওয়ায় বসিয়ে রাখত; বলতে বলতে অনেক দূর অতীতে চলে যায় ভিখু, কপালে ভাঁজ পড়ে, গরম নিঃশ্বাস বের হ'তে থাকে।

মরণী কোন কথা বলে না। চুপ করে শোনে ভিখুর কথা। ভিখু সেই দূর অতীতে গিয়ে বলতে থাকে; চুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়; আকাশের রং পালটায়। মানুষ জন পাখিরা ঘরে ফেরে, আমি ঠায় দাওয়ায় বসে থাকি, মা কোলে করে ঘরে নিয়ে যায়, সেই আমিই যে কোনদিন কাঠ চিরে রোজগার করবো কেউ কী ভেবেছে···বলেই অদ্ভুত সুন্দর হাসে ভিখু।

মরণী বলে, 'কিন্তু বাসুর যে ফিটের ব্যারাম; এই তো সেদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেল, দাঁতে দাঁত লেগে গেল। তাই ভাবি গো, ছেলেটা আমার···ঠিক সেই সময় বাসু এসে হাজির হয়। ভিখু একবার এক পলক বাসুকে দেখে নিয়ে অকারণেই উঠোনে গজানো আগাছাগুলোকে তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাসুর শুকনো মুখটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে মরণী,

'তা' কোথায় গেলি রে আজ।'

বাসু উত্তরে বলে, 'হরিপদ-দা আজ বেশী দূর থেতে চাইল না। শরীরটায় জুত পাচ্ছিল না হরিপদদা। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

মনে মনে ভাবল মরণী, ভালই করেছে তাড়াতাড়ি ফিরে। দেরি হ'লে দুশ্চিন্তায় উথাল-পাতাল করতো মনটা! অবশ্য ওই মানুষটাকে উপর থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু মরণী জানে মানুষটা ভেতরে একেদারেই কাঁদার ডেলা। একটু সোহাগ দিয়েছ কী দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে নাববে, অনেকক্ষণ ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদবে। তারপর নিজেকেই

তারপর নিজেকেই একসময় গালাগাল দিয়ে দাঁত বের করে হাসবে।

দূর থেকে হরেন মণ্ডলকে আসতে দেখে মরণী প্রায় নিঃশব্দে ফিসফিসে গলায় বাসুকে বলে, 'হারু কাকাকে বল্‌গে আজকে তোর বাবার শরীল খারাপ।

—'কিন্তু বাবাকে যে দেখতে পাচ্ছে হারুকাকা।'

—'দেখুক, তুই তবু যেয়ে বল।'

কী মনে করে বাসু এগিয়ে যায়। হরেন মণ্ডলের সামনে দাঁড়িয়ে ধীর গলায় বলে, 'কাকা, বাবার শরীর খারাপ।'

সে কথায় হরেন মণ্ডলের চোখ জোড়া কুঁচকে যায়। কয়েক সেকেণ্ড কী চিন্তা করে। খিক্ খিক্ করে হেসে বলে, 'চ, যাই তোর বাপ্‌কে দেখে আসি।'

বাসুর পা সরে না। মার আচরণ, হারু কাকার অমন খিকখিক করা হাসির কোন অর্থই সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না বাসু। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরেন মণ্ডল ঘাড় কাত করে বাসুকে দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁরে বেসো, ভিখুর শরীর খারাপ, তা উঠোনে খালি গায়ে কী কচ্ছে রে? বাসু উত্তর দেয়না। সে ধীর পায়ে অনুসরণ করতে থাকে হরেন মণ্ডলকে। হরেন প্রায় চিৎকার করে ডাক দেয় ভিখুকে, 'এই ভিখু কী হয়েছে তোর? বেসো বলল, তোর শরীর খারাপ।'

ভিখু অবাক হয়ে যায় সে কথায়। ভিখুর শরীর খারাপ এটা যে বাসু বানিয়ে বলবে, বিশ্বাস হয় না ভিখুর। সে কিছুক্ষণ কি যেন

ভাবে। তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'হ্যাঁগো শরীরটা আজ যেন ক্যামন বেজুত ঠেকছে।'

হো হো করে হেসে ফেলে হরেন ও কথায়। বলে, 'চল, চল, পেটে ওষুধ ঢাল, বেজুত ভাব কেটে যাবে এক মিনিটে।

হরেনের কথার অর্থ বুঝতে পারে বাসু। আর এও বোঝে, মা কেন বাবার শরীর খারাপ, একথাটা হারু কাকাকে বলতে বলেছে! মার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই বুকটা হাল্কা হয়ে যায় বাসুর। দেখে, পাথরের মত কঠিন মুখটা কি ভীষণ অসহায়!

হরেনের কথা শুনে হেসে ফেলে ভিখু। কিসের খুশীতে চোখদুটো জোনাকীর মত জ্বলতে থাকে। বলে, হারু আজ আমার বড় খুশীর দিন। বেসো আমার রোজগার করতে লেগেছে।

চোখদুটো বড় হয়ে ওঠে হরেনের। শুধোয়, কী কাজ করছ বেসো!

—হরিপদ-র সংগে আজ থেকে বেরোচ্ছে।'

যেন খুব মজার কথা শুনলো হরেন। প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে পেট চেপে বসে পড়ল।

ভিখু, বাসু, মরণী কেউই ভেবে পেল না, ও কথায় হাসির কী পেল হারু।

ভিখু অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই, তা এতে হাসার কী হলো? হাসতে হাসতেই উত্তর দিলো হরেন, 'বল্, ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে···তা না বলে বলছিস কাজে লেগেছে···বলেই দমকে দমকে হাসতে লাগল হরেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাসু দেখতে পেল, ভিখু আর মরণী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন প্রচণ্ড ঘৃণা আর লজ্জা ওদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু কী হ'লো বাসুর, বাসু প্রচণ্ড জোড়ে চিৎকার করে উঠলো, সে চিৎকারে আশেপাশের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। 'কোন শালা বলছে, আমি ভিখিরি, আমি ভিক্ষে করি।' যেন কথাটা একবার নয়, বার কয়েক উচ্চারণ করল বাসু।

স্তম্ভিত হারু অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল বাসুকে। বাসু ধীর গলায় বলল, 'ভিক্ষা করবো কেন হারুকাকা। হরিপদ-দা গান গায়—

লোকে গান শুনে পয়সা দেয়। এমনি তো দেয় না। আমি হরিপদদাকে পথ চলতে সাহায্য করি। একে ভিক্ষে করা বলে হারুকাকা?

হরেন মণ্ডল সে সবের মধ্যে না গিয়ে, ভিখুকে বললো, 'যদি যাস্ তো চলে আয়, আমি চললাম।'

* * *

অনেক রাতে বাসুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলো, ভিখু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বুকের ভেতর থেকে গলার কাছে থরথর করে কি যেন উঠে এসে থমকে গেল। গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল বাসুর।

ভিখু ধীর শান্ত গলায় বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস বেসো, তুই ঠিক বলেছিস'।

সে কথায় মুহূর্ত্তে বাসুর বুকটা হাল্কা হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্বাদ পেয়ে ওর সমস্ত শরীরটা থিরথির করে কাঁপতে লাগল।

কী মনে করে ভিখু বাসুর পাশে শুয়ে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

গল্প

মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুর

জয়া রায়

ভি, আই, পি রোডের একপাশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সল্ট লেকের বুকে। ঢালু মাটিটুকু দু, তিন লাফে টপকে নীচে নেমে পড়ল শুভ। তারপর পিছন ফিরে রুণার দিকে তাকিয়ে বলল—এসো।

চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নামল রুণা।

সামনে ছড়ানো রয়েছে জমি একটা বিরাট সমুদ্রের মতো। কুলিদের হাতের কোদাল আর গাঁইতিগুলো নিষ্ঠুরের মতো নেমে আসছে মাটির বুকে। মাটি খোঁড়া হ'চ্ছে। একটানা শব্দ হ'চ্ছে ধুপধাপ। একটা যান্ত্রিক জীবন যেন গ্রাস করেছে লবন হ্রদের জন্য সভ্যতাকে।

মেঘলা দুপুর, শুকনো হাওয়া দিচ্ছে, তাল তাল কাদার মতো কালো মেঘে ঢেকে গেছে সারা আকাশ! রোদ্দুর যেন লুকিয়ে পড়েছে মেঘের আড়ালে। মেঘের ভারে গোটা আকাশ নুয়ে পড়েছে লবন হ্রদের জলা জমির বুকে।

আলসেমি মাখা দুপুরের নোনা বাতাসে আস্তে আস্তে দম নিতে লাগল রুণা। হাতের বইখাতাগুলো বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে শাড়ীর আঁচলটা গায়ের ওপর টেনে দিল। তারপর অবাক চোখের দৃষ্টি চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—কি সুন্দর, তাই না?

হাসল শুভ—হ্যাঁ খুব সুন্দর।

উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে লাগল ওরা।

মাঝে মাঝে চুন, বালি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। তাতে গজিয়েছে অশথ, বটের চারা, ছোট্ট ছোট্ট লাল ঘরের মত ছড়িয়ে আছে ইটের গাদা। ভিত্ খোঁড়া হ'চ্ছে, মাটির ঢিবির ওপর বসে কেউ কেউ বিড়িতে টান দিচ্ছে। গর্তের মধ্যে নেমে পড়ল শুভ।

মাটির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল রুণা। দুষ্টুমি ভরা হাসি। অবাক হ'ল শুভ, বলল—হাসছো যে?

—এমনি?

গর্তের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল শুভ। ওর সাথে সাথে রুণাও মাটির স্তূপ অতিক্রম করতে লাগল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শুভ, কোমরে হাত রেখে বলল—এখানে নামবে?

মাথা নাড়ল রুণা।

হাত বাড়িয়ে বলল শুভ—এসো।

—না।

—আমার হাতটা ধরে লাফিয়ে পড়।

—না, আমি পারব না।

তুমি একটা ভীতু। ভেংচি কাটল শুভ।

চোখ বন্ধ করল রুণা। চাপা হাসি ঝিলিক দিল ঠোঁটের কোণে, হাত নেড়ে বলল—আর তুমি?

—আমি তোমার মত ভীতু নই।

জোরে হেসে উঠল রুণা। ওর চোখে মেঘলা দুপুরের ঘুমন্ত ছায়া। বলল—তুমি একটা সৃত্যিকারের কাপুরুষ।

—কি বললে? গর্তের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল শুভ। কিন্তু তার আগেই মাটির স্তূপ পার হয়ে মাঠে নেমে পড়ল রুণা।

সামনে একটা বাড়ির ছাদ ঢালাই হ'চ্ছে বোধহয়। সিমেন্ট, বালি মেশানোর যন্ত্রটা থেকে থেকে একটা দানবের মত চিৎকার করে উঠছে। এখানে, ওখানে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে ইটের টুকরো। পাথরের কুচি। কুলিরা মাথায় ইট, মশলা নিয়ে ভাড়া বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। খালি কড়াই হাতে নেমে আসছে কয়েকজন। ওদের কাজ দেখতে দেখতে থেমে পড়ল রুণা। দ্রুত পায়ে ওর কাছে হেঁটে এল শুভ।

—তুমি আমায় কাঐরুষ বললে।

কাছে সরে এল রুণা। কৌতুকে ছটফট করে উঠল দুচোখের তারা।

—কে বলে কাপুরুষ, যে প্রেম করতে চলে আসে পৃথিবীর অপর প্রান্তে। একটু দম নিল রুণা। চোখে বুজে হাসি আটকে বলল—তুমি একটা বীরপুরুষ। তারপর বইখাতাগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—একটু ধরবে এগুলো? হাত ব্যথা করছে।

—এগুলো নিয়ে এলে কেন? কাঠ কাঠ গলায় বলল শুভ।

—না আনলে যে মার কাছে ধরা পড়তুম বীরপুরুষ মশাই।

—ধরা পড়লেই বা।

চমকে উঠল রুণা। শুভর দিকে তাকিয়ে রইল। সারা মুখে নীলচে আভা ছড়ানো, ফিসফিসিয়ে বলল—আমার ভয় করেনা বুঝি? ব্যথায় করুণ হয়ে এল রুণার গলা—জানো, আমার ভীষণ ভয় করে, এভাবে লুকিয়ে বেড়াতে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার ভীষণ ভয় করে।

রুণার খুব কাছে এগিয়ে এল শুভ,—ওর নরম হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মুঠোয়। একটু হেসে বলল—ভয় কি?……

ইট, বালির গাদা ফেলে চলতে লাগল ওরা। পেছনে পড়ে যান্ত্রিক জীবন। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ, এদিকে ওদিকে জল জমে আছে। জলের মধ্য দিয়ে সবুজ ঘাস গলা বাড়িয়ে আকাশটাকে যেন দেখছে। দূরে রেললাইনটাকে একটা অস্পষ্ট জিজ্ঞাসার মত লাগছে। লাইনের ধারে তারকাঁটায় বেড়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে। দু'একটা গোরু এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। লোকের চিহ্ন মুছে আসছে ক্রমশঃ। কালো আকাশ মেঘে মেঘে হয়ে আসছে আরও কালো। দু'একটা কাক অশান্ত ডানায় পাড়ি দিচ্ছে মস্ত আকাশ। ঝড়ের হাওয়ায় বিপদের গন্ধ যেন পেয়েছে ওরা।

চোখে একটা খুশীর মায়া মেখে নিয়ে চলতে লাগল রুণা। হঠাৎ আকাশে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। রুণা বলল—আমার এত ভালো লাগছে।

—আমারও।

—জানো, এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

পায়ের কাছে একটা শুকনো চোরকাঁটার ডাল পড়েছিল। তুলে নিল শুভ। তাকাল রুণার দিকে।

হাল্কা পায়ে হাঁটছে রুণা। শুভকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে অনেকটা দূর। জল, কাদার মাঝে এতটুকু মাটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে রুণা। ওকে একটা মূর্তির মত লাগছে। মাতাল হওয়ায় ওর চুল এসে পড়ছে চোখে মুখে। শাড়ীটা উড়ছে ছেলেমানুষের মতো। চোরকাঁটার শুকনো ডালটা ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়ে ওর দিকে এগিয়ে

গেল শুভ। দুরন্ত হাওয়ার মাঝখানে নিজেদের সঁপে দিল ওরা। একটা সুন্দর, উন্মুক্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে একটা ট্রেণ চলে গেল। চাকার ঘর্ঘর শব্দ সারা প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। সেই শব্দটা যেন কান পেতে শুনতে চাইল ওরা। ফিসফিসিয়ে বলল শুভ—রুণা… আমার……আমার এখান থেকে একটুও চলে যেতে ইচ্ছে করছেনা।

—আমারও না।

—রুণা, আমরা যদি এখানে থাকতে পারতাম।

আকাশ মেঘে অন্ধকার। কিন্তু রুণার চোখে আলো। আকাশ যেন মেঘের ভারে নুয়ে পড়েছে। হাত বাড়ালেই তাকে ধরা যায়। চাপা গলায় বলল শুভ—আমরা যদি এখানে থাকতে পারতাম।

মাটির দিকে তাকাল রুণা। ওদের পায়ের ছাপ ফুটে উঠেছে নরম মাটির বুকে। দলিত ঘাসের বুকে, নরম মাটির হৃদয়ে আঁকা হয়ে গেছে প্রাণের স্পন্দন। শান্ত গলায় বলল, রুণা—বৃষ্টি আসবে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আমাদের পায়ের ছাপগুলো মুছে যাবে তাহ'লে?

উত্তর দিল না শুভ।

বুকের কাছে বইখাতাগুলো আঁকড়ে ধরল রুণা। শুধু বইখাতা নয়, তার সাথে যেন আরও পবিত্র কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে রুণা।

—এ্যাই, এখানেও বাড়ী উঠবে?

—হ্যাঁ উঠবে। ইট, কাঠের খাঁচা হ'বে এক একটা। দুচোখ যেন জ্বলে উঠল শুভর। বলল—আমাদের প্রাণের মুক্তিকেই শেকল দিয়ে বাঁধবে ওরা।

—সব কিছু মুছে যাবে? রুণার গলায় একরাশ হতাশা।

—যায় না, যায় না, যায় না, কিছুই মোছা যায় না।

হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে, বৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এল দমকা বাতাস। ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। বড় বড় ফোঁটাগুলো জলের মধ্যে এক একটা বৃত্ত সৃষ্টি করতে লাগল।

জোরে জোরে হাঁটতে লাগল শুভ।

রুণার ভালো লাগছিল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন ওর মনের এক

অদম্য আশার চারায় জল দিচ্ছিল। ও বৃষ্টির স্বাদ নেবার চেষ্টা করছিল।

একটা নতুন খুশীতে ভরে গেল রুণার মন।

হাঁটছিল রুণা, থেমে গেল। পেছন ফিরে বলল শুভ—একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। নয়ত ভীষণ ভিজবে।

হাসল রুণা—আমার যে ভিজতে ইচ্ছে করছে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল শুভ, বলল—তোমার ভয় করছে না?

প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল রুণা, বলল—কিসের ভয়?

একটু দম নিল শুভ—তুমি ভিজে বাড়ী ফিরলে মা যদি বকেন?

—সব বলব।

—আজকে এখানে আসার কথা তুমি বলতে পারবে?

শান্ত গলায় হাসল রুণা—পারব।

—ভয় করবে না?

—না।

—কিন্তু তোমার শাড়ীতে যে কাদা লাগছে।

—লাগুক।

—তোমার বইখাতাগুলো, করুণ হয়ে এল শুভর গলা।—

—ভিজুক।

চাপা গলায় বলল শুভ—তোমার ভয় করছে না?

দীপ্ত চোখে তাকাল রুণা। ওর চোখে চুনীর আলো জ্বলছে। শুভর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল রুণা—না, না, না। রুণার পিঠে হাত রাখল শুভ, ওকে ভীষণ আপন আপন মনে হ'তে লাগল। সব লজ্জা, সব অপমান, সব ভয়ের বেড়া ডিঙিয়ে রুণা যেন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আকাশ থেকে খসে পড়া কক্ষচ্যুত তারাদের মতো মনে হল নিজেদের। পিঠের ওপর থেকে শুভর হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল রুণা। এগিয়ে গেল সামনে। দুরন্ত হাওয়া আর বৃষ্টির মাঝে সঁপে দিল নিজেকে।

একটা সুন্দর নিস্তব্ধতায় ভরে যেতে লাগল চারদিক। শুধু ভেসে আসতে লাগল ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাক। দূরে একটা অজগরের মতো পড়ে রয়েছে ভি, আই, পি রোড। মাঝে মাঝে দু'চারটে গাড়ী গর্জ্জন তুলে যাতায়াত করছে।

ওদের যেন দুরন্ত পাগলামীতে পেয়ে বসল। চুন, বালির গাদার ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ভিজতে লাগল ওরা। বৃষ্টির ছাটে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল চারদিক।

বৃষ্টি শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু আকাশের মুখ ভার। থেকে

থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

ভি, আই, পি রোড ধরে হাঁটছে ওরা। সূর্যের আলো হারিয়ে গেছে অচেনা অন্ধকারে। আবছা আলোর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে দিগন্তটুকু। একটা অচেনা খেয়ালের বসে হাঁটছিল ওরা।

বৃষ্টিতে ভিজেছে দুজনেই। চুল কপালের ওপর লেপটে আছে। রুণার কাপড়ে লেগেছে ছোপ ছোপ কাদা। সোঁদামাটির গন্ধ মাখা সবুজ বনের বুনো ফুলের মতো লাগছিল রুণাকে দেখতে।

ওর কাছে সরে এল শুভ। ওর পাশে হাঁটতে লাগল।

রুণা সব দেখছে। নরম আকাশকে দুচোখ ভরে দেখছে। ভেজা বাতাসের, ভেজা মাটির গন্ধ প্রাণ ভরে টেনে নিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড নিঝুম চেতনার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

ফিসফিসিয়ে বলল শুভ—রুণা, আজ তোমাকে খুব ভাল লাগছে। খুব সুন্দর লাগছে। তুমি এত সুন্দর হ'তে জান, আমি আগে জানতুম না।

বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল রুণা—এখন কলেজে থাকলে নিশ্চয় এ, কে, বি-র ক্লাস করতে হ'তো।

আজকের দিনে কলেজের কথা না হয় থাক রুণা।

শুভ যেন একটা কিছুর মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছিল।···যায়, যায়, এই ভেজা বাতাসের গন্ধ প্রাণ ভরে টানা যায়··· এই নিঝুম চেতনায় হারিয়ে যাওয়া যায়···আর রুণার মত একটা নরম মেয়েকে দুহাতে আঁকড়ে বুকে রাখা যায়। রুণার দু'কাঁধ শক্ত করে ধরল শুভ, নিভু নিভু গলায় বলল—রুণা, আমার যেন কেমন লাগছে, রুণা··· এত নির্জ্জন, ···এত নিস্তব্ধ···এত ভয়াবহ···রুণা, আমার ভয় করছে রুণা। হাসল রুণা। সুন্দর চোখ ঝকমক করে উঠল। ঠোঁটে ফুটল শান্ত হাসি। আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল মুখ। স্থির হয়ে তাকাল শুভর দিকে। ওর চোখের তারায় নিজেকেই দেখতে পেল রুণা। ফিসফিস করে বলল—ভয় কি!

সারা প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে বাজতে লাগল—ভয় কি! ভয় কি! ভয় কি!

রুণাকে যেন এতদিন পরে নতুন করে দেখতে পেল শুভ। সহসা প্রচণ্ড গর্জ্জন করে আকাশের বুক চিরে দিয়ে একটা প্লেন চলে গেল। মেঘের ফাটল দিয়ে এতক্ষণ পরে উঁকি দিল এক চিলতে রোদ্দুর।

গল্প

গাছ জানে পাখী জানে রুনু জানে না

রবীন্দ্র গুহ

হঠাৎ মা উঠে দাঁড়ালেন—আমি যাই।

যদিও অতসীকুসুমশ্যাম রুনুর হৃদয়, তথাপি এ সময়, সে, রুনু, যেনবা এক ভয়ংকর কাঁটায় ঝুলন্ত ফুলমালা, সুডৌল মুখখানা ছুঁয়ে, মুখের সরলতা ছুঁয়ে সূর্য তীব্র হয়ে ছোটে। হঠাৎই হাতের ওপর, কাছে, বিন্দু বিন্দু রক্তের দাগ, তা ক্রমাগত রঙ্ বদলাচ্ছিল—কখনো ভাসমান ফিকে গাঙ্ অথবা কৃষ্ণময়ী, লক্ষনবিশিষ্ট ছায়া নীল অচিরাৎ মেঘবর্ণ।

এতদ্দর্শনে সে, বেচারী রুনু, নিঝুম হয়ে বসে ধারা বেগে অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদতে থাকল।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটল। শেষে, লাজুক গোপনতাকে অগ্রাহ্য করে ক্রন্দন—ব্যহত স্বরেই চিক্কুর দিয়ে বলতে থাকেন—মা, মাগো, তুমি যেও না—যেওনা—

কিন্তু মা সত্যি সত্যি দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রুনু খুবর হতাশ হল, সে মনে মনে ভেবে স্থির করল, গল্পের বাকী অংশটুকু পরে কখনো মাকে শোনাবে। পরদেশী পাখিটিকেই তার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে। রুনু তাই ঠিক করল, মাকে সে আরো সুন্দর করে গুছিয়ে বলবে গল্পের শেষটুকু। রুগ্ন পাখিটির কথা বিশদভাবে বলবে, তার রোগ শোকের কথা বলবে। অসীম দুঃখ কষ্টের কথা বলবে। সারারাত নিঃসঙ্গভাবে গাছের ডালে প্রতীক্ষা করে থাকার কথা বলবে। এবং তার, মানে, রুনুর, দৃঢ় বিশ্বাস গল্পের শেষটুকু মার ভালো লাগবে, মা কাঁদবেন। মার অমন সুন্দর দুটি চোখ অশ্রুজলে টলমল করবে। রুনু জানে, মার হৃদয় খুব কোমল, অবিকল অতসীকুসুম সন। তাই দেখে রুনুর খুব ভালো লাগবে কী? লাগবে।

মানুষের দুঃখে মানুষ কাঁদে, প্রিয়—প্রিয় পশুপাখির দুঃখেও কাঁদে, কিন্তু রূপকথার গল্প বুনে কাঁদে কজন?

হঠাৎ একদিন রুনুদের ছোট মাসি, যিনি বয়স পেরিয়ে সেদিন বিয়ে করলেন, বেড়াতে এলেন রুনুদের বাড়ি। খুব সুন্দর করে সেজে-ছিলেন ছোটমাসি, হাতে গলায় এমন কি চুলের খোঁপায় সোনার গহনা। একখানা জাম রঙের চওড়া পাড় শাড়ি পড়েছিলেন। সেরকম শাড়ি রুনু আজ পর্য্যন্ত কাউকে পড়তে দেখেনি। রুনু ভেবে অবাক হ'ল, এই ছোট মাসিই সাজ পোষাক সম্বন্ধে কত উদাসীন ছিলেন। বিয়ে তিনি করবেন না বলেই স্থির করছিলেন। বিয়ের প্রতি তার এক ধরনের অস্বাভাবিক ঘৃণা ছিল—অথচ তিনি বিয়ে করলেন।

ছোট মাসি খুব হৈ চৈ করছিলেন।

তিনি পাখির মত উড়তে উড়তে রুনুর পড়ার ঘরে এলেন। ঘরটা নোংরা এবং গুমসানো বলে অভিযোগ করলেন। ছোটমাসি সবচেয়ে মজা করলেন বাবার সঙ্গে। এমন এমন কথা বললেন, বাবার মত গম্ভীর লোকও হেসে কুটিপাটি, বাবার হাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, পিঠে সুড়সুড়ি দিলেন।

যাবার আগে ছোট মাসি মার হাত ধরে একটা আলাদা ঘরে ঢুকলেন, তখন তার গলার স্বর খুব নীচু এবং গম্ভীর টুপটাপ শিশির ঝরার মত কথা ঝরল।

—তাকে ওঁরা কলকাতা দিয়ে এসেছে।

ছোট মাসির দৃষ্টি দেয়ালের দিকে, বিদঘুটে পিঠ।

—রোগটা খুব শক্ত। আপাততঃ পি জি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। মার আলুলায়িত কেশরাশি—ঘন মেঘের মত—বিদঘুটে অন্ধকারের মত।

—আমি গিয়েছিলাম—বুঝলি—খুব কষ্ট পাচ্ছে দেখলাম।

যেন মারাত্মক কোন বিষধর পতঙ্গ কানের কাছে গুঞ্জন করছে। মা তবু ভয় পাচ্ছেন না। মা পালাবার কোন চেষ্টাই করছেন না। ছোটমাসি কিছুক্ষণ চুপ। একটা ছবির দিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে বললেন—তুই একবার যাবি নাকি?

কে যেন মার শরীরে চাবুক মারল। যন্ত্রণায় তিনি কাঁপতে থাকলেন।

মা রক্তাক্ত, মা ছটফট করছেন। এবং বলছেন—না—না—না। একটু পরে ছোট মাসি চলে গেলেন। বাবা কাগজ নিয়ে বসলেন। রুনু একটা বইএর পাতায় চোখ রেখে দেখল, সুন্দর শুভ্র একটা ঘোড়া, তার পিঠে উপবিষ্ট চতুর রঘুপতি, হাতে রূপোর দণ্ড, সোনার দণ্ড।

পরদিন বাবা খুব দেরী করে ফিরলেন।

মা শান্তস্বরে শুধালেন—এত দেরী হল যে? কোথাও গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

বাবা হাত দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বললেন—হাসপাতালে।

মার চোখে একঝলক আগুনের তাপ। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তে লাগলেন।

পরদিন বাবা আবার—দেরি করে এলেন। গাড়িটা গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে নম্র পায়ে হেঁটে আসছিলেন।

মা অবাক হলেন—ওকি, গাড়িটা তুললে না?

বাবা বললেন—না। আবার বেরুবো।

—এত রাত্রে?

বাবার বুক পিঠ অন্ধকারে তালগোল পাকানো। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। মার কাছাকাছি আসতেই, একটু দাঁড়ালেন, কি ভাবলেন, তারপর বলতে থাকলেন—ওকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হ'বে। আজ রাত্রেই হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। তুমি যাবে নাকি একবার।

মার চোখে জল। মারা নাসা স্ফীত। মার মুখমণ্ডল ক্ষোভে কম্পমান। বাবা চোখ মেলে তাকাতেই দেখলেন, মা নেই। তিনি তখন রুনুর কাছে গল্প শুনছেন—সেই পাখিটা, যে একদিন হঠাৎ উদাও হয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছিল। তার শরীর তখন ভয়ানক রুগ্ন। ক্লান্ত। সে এসে দেখল, পুরনো সংসারটা ভেঙ্গে নতুন হয়েছে। সেখানে অনেক কচি কচি মুখ। দুঃখশোকে সে বড় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সারাটা রাত দুঃখে অনাহারে কাটিয়ে ভোরবেলা তার মৃত্যু হ'ল। অন্য পাখি দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়াল দিতে দিতে দেখল—মৃতদেহটা কাত হয়ে ঝুলছে একটা গাছের ডালে।

—

গল্প

পরিশেষ এরপর এলো

বাণীব্রত চক্রবর্তী

এই ভাবেই আমরা এসে দাঁড়াই একটি বনানীর কাছে। সব ফুল আমি চিনিনা। সব গাছের নাম ও আমি বলতে পারবো না। তবে জানি এ সব আমার। জানি তোমারো। তুমি আমি আলাদা নই। আর তাই তো আমি ধরেছিলুম তোমার হাত। নাকি তুমিই ধরে রেখেছিলে আমার হাত। আর ছাপো পাতাদের সবুজ শরীরে কতো শিরা উপশিরা। তেমনটি কি আমাদের ও নেই? আছে তো বটেই। সেফ্‌টিপিন ফুটিয়ে শরীর খুঁড়ে খুঁজে আনি রক্ত। তুমি চমকাও। তোমার অমন আর্ত চোখ আমার ভয়ঙ্কর ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই কি আমি রক্তের অন্বেষণ করলুম? তা নয়। কষ্টও তো ভালো লাগার একটা দিক। এই ভাবেই আমরা যাই এক গভীর নদীর কাছে। নদীর জল অসম্ভব নীল। আশ্চর্য ঐ সুনীল জলের মাঝে একটা গোরু মরে পচে ঢোল হয়ে ভেসে যাচ্ছিলো তো। ঠিক ছবির মতো পত্রবহুল গাছেরা ফুল নিয়ে পাতা নিয়ে পাখি উড়িয়ে পাখি রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেও একটা গাছ কি অসম্ভব নয়, তার পাতা নেই, ফুল নেই, পাখিই বা থাকে কি করে। বাজে পুড়ে ঝলসে পোড়া কাঠ হয়ে ন্যাড়া একটা গাছই রইলো সে। তাই আমরা বললুম 'আমরা পাহাড়ের কাছে যাবো না।' সংবাদ পত্র জানিয়েছিলো—

'মানুষ দুরতম কল্পনা দিয়েও যা স্পর্শ করতে পারে না, তেমন এক বিস্ফোরণ ঘটেছে সূর্যদেহে—মেগাটন শক্তি সম্পন্ন কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা যুগপৎ বিস্ফোরিত হলে ব্যাপারটি যা দাঁড়ায় তেমনি এক ঘটনায়, তেমনই এক ঘটনায় সামগ্রিকভাবে সূর্যের গ্যাসীয় দেহে

লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।'

সুতরাং সেও চায়নি সূর্যের সামীপ্য। সে বললো, 'হাত ছাড়ো।' নাকি আমিই বলেছিলুম হাত ছাড়ার কথা।

পরিশেষ তখনো আসেনি। তার রক্তে কি ছিলো, ছিলো বুঝি অজস্র ঝিনুক, সাত রঙ আলাদা আলাদা করে নয় একেবারে একটা, তাই বলি সাতরঙা। আমার রক্তেও কিছুই থাকেনি। আটলান্টিক সাগরের অনেক নিচে খেলনার পুতুলের মতো জীব জন্তুরা থাকে। সে ঘোড়ার ও কেশর থাকে, হাতিদের শুঁড় আছে যদিয়ো মাহুত নেই। আছে ছোটো ছোটো কুকুর বেড়াল এবং সাধ্যাতীত স্বাধীনতার অধিকার। আমাদের অধিকার নেই, রক্ত শুধু যে লাল।

তার শাড়ি কথামতো বাতাসে ওড়ে। কথা মতো খুলে যায়। তারপর সায়া। তারপর ব্লাউজ খুলে গেলে আচম্‌কা ব্রাটিও যায় উড়ে। আশ্চর্য তার স্তন ক্রমশ বুকের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তার যোনিও থাকে না। কোথায় নিতম্ব তার। যাদুকর কোথায় ছিলো কে জানে। শরীরের মাংস ও লুঠ। খট্ খট্ করে একটি কংকাল শুধু ছোটে, এবং আমিও দেখি অনুরূপ কংকাল বটে। কোথায় আমার শার্ট, আমার রিষ্ট-ওয়াচ, প্রিয় সিগারেটগুলি। বনানীও সরে যায়, সরে যায় সুনীল নদীটি। যেহেতু পাহাড়ে যাইনি তাই পাহাড় আসেনি কাছে আর তারো তাই পালাবার দরকার হয়নি। সীমাহীন মাঠের উপর দুটি কংকাল ছুটতে থাকে। সীমাহীন মাঠের উপর দুটি কংকাল উড়তে থাকে। তখন আকাশও নেই, ভূমিও নেই। অনন্ত ব্যোমে আর তখন কঙ্কালেরাও থাকে না।

পরিশেষ এর পর এলো।

—

কবিতা

শুরু না বিদায় ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

একটানা খাত—
সার বেঁধে আছে গাছগুলো,
নিবিড় বিমনা ছায়া :
জল থেকে উঠে আসে ঠাণ্ডা
গাছ থেকে সুগন্ধ ;
খোয়া-বাঁধানো পাড়ের পথ ধ'রে
গ'র্জে আসছে মোটর-বাইক—
গোপন কার বার্তা নিয়ে অচিন আরোহী
থামে ওই মঞ্জিলের সমুখে।

ব্যালকনির 'পরে
এলোমেলো শালীনতা নিয়ে
ব'সে আছে প্রিয় নারী,
বহু যত্নে জিইয়ে রেখেছে
মরুদ্যান
ক্রম-অগ্রসরমান বিনাশের থেকে।

ওকি শুরু না বিদায়—
হয়তো অগ্রিম দূত
অক্ষর পুরুষের।
তা না হ'লে জলে স্থলে
অমর বসন্ত কেন ঘনিয়ে উঠবে,
পাতা আলো ক'রে জাগে ফুল
শিশুরা গাইছে শোনো বীরত্বের গান।

বেশ তাহলে যুদ্ধই হোক ॥ স্বপন রায়

বেশ তাহলে যুদ্ধই হোক
ভেবোনা বশ্যতা স্বীকার করে
বিপন্ন বৈতালিকের নতজানু উপাসনা চেয়ে নেব
রক্তের যা রীতি পেশীর যা ধর্ম
সবচেয়ে বড় কথা
খিন্ন অবয়বে অবশিষ্ট যৌবন যা চায়
(জানোত যৌবন চিরকালই ক্ষত্রিয়)
তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন

সর্তাধীনে সন্ধি মেনে নিতে রাজি
বিশুদ্ধ শান্তির স্বার্থে
অন্যথায় যুদ্ধ
শুধু কষ্ট কল্পনার বিকল্প চাইনা।
বশ্যতা স্বীকার করে নতজানু উপাসনা
দেখ,
এই আমি কোষমুক্ত তরবারি তুলে নিচ্ছি হাতে।

ভালোবাসা তোমার বুকে এইসব রং ॥ ফণিভূষণ চক্রবর্তী

যেখানে শব্দ নেই
নিরব চোখের নিচে রঙিন আবেশ
যেখানে ঢেউ নেই
কল্লোলিনী খুঁজে নেয় বসন্ত বিহার
যেখানে আকাশে প্রাচীর
দুটি মন বৃষ্টি আর বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায় শুধু

কখনো বা ব্রীজ ভেঙে যায়
বুকের নিচে বৃষ্টি এলে
এবং যখনই আলো নিভে যায়—
তুমি আর আমি…
ফুটপাত ও অন্ধকার নিবিড় আবেশে একাকার
একমুঠো রাজহাঁস কিল্‌বিল্‌ করে ওঠে
দুধভরা বাটি যেন ঠোঁটের নাগালে।

মানুষের সারি ॥ মানস রায় চৌধুরী

নিঃশ্বাসে সুবাস ছিল দুচোখে গভীর মাদকতা
আমার সামনেই আছে দাঁড়িয়ে সৌরভ
রূপ তুমি এমন সুষমা
যাতে আমি মুহূর্তেই হারালাম আপন সত্তাকে
এক বিরল সম্মোহে
আমি চুরি করে নিই সেই বিভা
মানুষ ও মানুষীর সারিতে অপেক্ষমান থেকে—
নিঃশ্বাসে সুবাস ছিলো দুচোখে গভীর মাদকতা।

বৃষ্টিধারা ঝরেছিলো ঝঞ্ঝা কোনো করুণা করেনি
হতভাগ্য খঞ্জ ভিখারীকে—
বাড়িয়েছে দুঃখ যার বুকের ঘনিষ্ঠতায়
ঝুলে-থাকা উলঙ্গ শিশুটি।
তার দুঃখ উপশমে কোনো কিছু দেয়নি শূন্যতা
বৃষ্টিধারা ঝরেছিলো ঝঞ্ঝা করুণা করেনি।

এই বোম্বাই-এর ছবি। আহা একে রাত্রে খুলে দেখ
যখন বর্ণালী আর সুরভি স্বাধীনভাবে বিছায় তাদের মোহজাল
এ এক লুব্ধতাভরা সংক্ষিপ্ত পৃথিবী
চতুর্দিকে মায়া মায়াবিনী
এ যেন মধুর স্বপ্ন ফুটে ওঠে আলোক মালায়
এই বোম্বাই-এর ছবি, আহা একে রাত্রে খুলে দেখো।

এ শহরকে 'বিদায়' জানিয়ে যাও দ্রুত সরে, এখনি পালাও।
বিশাল মোহন মায়া বিছিয়েছে তার ব্যাপ্তজাল
সোনার বেড়িতে আগে বেঁধে ফ্যালে তোমাকে সে,
সম্মোহিত তুমি
শৃঙ্খলে জড়ায় সব অনুভব, দীর্ঘায়িত করে স্থিতি এখানে তোমার
এ শহরকে 'বিদায়' জানিয়ে যাও দ্রুত সরে
এখনি পালাও।

[প্রভু চুঘানির মূল সিন্ধি কবিতার অনুবাদ]

তবু কেন ॥ সৈয়দ কওসর জামাল

ছায়া ঘেরা জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে স্মৃতির বিছানা
অচল পয়সার মত বন্ধুপ্রীতি—আমি তো হারিয়েছি কবে
সেই কোন্ অভিমানে, কিংবা বিষাদে
তবু কেন ভালবাসা—পুরনো ক্ষতের মত জেগে ওঠে
রুগ্ন মানুষের মত শুয়ে থাকে মানুষের শোক
ওকি বিলাসিতা, কৃত্রিম দুঃখবোধ-চিত্রকল্প কবিতার জন্যে ?

নদীর ওপার থেকে ক্ষীন ভেসে আসে তোমাদের গান
শিলীভূত শিল্পের দ্যুতি অমল চেতনায়—রৌদ্রের মত
তবু কেন লিখে ফেলি মাঝে মাঝে শোকগাথা
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেশ আপ্লুত করে দেয় বুকের ভিতর ?
তোমরা তো দুঃখে নও, কিংবা মেঘকালো আকাশের ছবি
অলঙ্কার-কল্প হয়ে আছো আমার কবিতায়, শীতার্ত দিনের উপমা

জলের শাড়ীর নীচে ॥ সাধনা মুখোপাধ্যায়

জলের শাড়ীর নীচে কি শরীর
কেউ তা জানে না
হয়তো মাছেরা জানে
হয়তো শৈবাল জানে
সে দেহের উচ্চাচ্চ মানে
অন্য কোন ভিন্ চোখে
অন্য কোন ভিন্ প্রতিভাসে
সে দেহের কণক্ষিণ
আভাসে ভাসে না
জলের শাড়ীর তলা
জল পরীদের এক
সংরক্ষিত বন
মর্ত্য মানুষের কোন
ছিপাঘাত নিষিদ্ধ
কুন্তীর শুক্তি আর হাঙর নীলাভ দ্যুতি
সম্পর্ক যেমনই হোক
অবাধ স্বাধীন বিচরণ

অন্বেষণ, কেন দুঃখ ॥ গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকড়ের কাছে গচ্ছিত রেখেছি এক নিবিড় দীর্ঘশ্বাস
যা আমার করতল স্পর্শ কোরে
ঢাকেনি করুণ মুখ
তবুও অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার হাঁটা চলা
এবং অনুভবের ভিতর বৃথা অন্বেষন
এমন অভাবের ভিতর কখন বেজে ওঠে তোমার প্রতিজ্ঞা
এবং সম্মোহিত নিরুদ্দিষ্ট প্রবাসে আমার নিশানবিহীন
জাহাজ ভেসে চলে
তবে কেন বৃথা দুঃখ

এভাবেই আমার শরীর থেকে খসে পড়ে
প্রাচীন অস্তিত্বের অনুভব
চোখ থেকে ঝরে পড়ে সফেদ দৃষ্টি অনিকেত
শিল্পের ভিতর সেই দীর্ঘশ্বাস খুঁজে খুঁজে যাই
তবে কেন বৃথা অন্বেষণ কেন দুঃখ

শুধু তোমাকে নিয়ে ॥ রঞ্জন পাল রায়

আমার সব দুঃখ ভুলে যাই
যখন তোমার মুখ মনে পড়ে,
তোমার কপালের এলোমেলো চুলের স্বকীয় সৌন্দর্য
আমায় দেয় গভীর প্রশান্তি
পৃথিবীর সব দুঃখ একমুহূর্তে নির্মেঘ হয়
যখন তোমার চোখে আমার শৈশব খেলা করে।

অবাধ্য বালকের মতো তোমাকে নিয়ে ছবি আঁকি
খেলা করে ছুটে যাই দূরে বহুদূরে
শুধু তোমাকে নিয়ে।
তোমার পবিত্র শরীর আমার শরীরে এনে দেয়
অনৈসর্গিক আনন্দ।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ

• নিকটবর্তী যে কোন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

• ভিটামিন সরবরাহ, ট্রীপল এন্টিজেন প্রদান

• মাঝে মাঝে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প: ব: পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

A.D.

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

সেল ! সেল !! সেল !!!

প্রতি জোড়া চপ্পলে ২০% হইতে ৩০% রিবেট দেওয়া হইতেছে

॥ আমাদের ষ্টক শেষ হতে চলেছে। সত্বর সংগ্রহ করুন ॥

—ঃ পদ সঙ্গম ঃ—

২২২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

(রাম মন্দির এবং গিরীশ পার্কের মাঝে অবস্থিত)

রূপালী রায় কর্তৃক ৮।১০৩, বিজয়গড় কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত এবং নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ ১৪, দুর্গাপিথুরী লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

দাম : চল্লিশ পয়সা